একটি স্বপ্নের মৃত্যু!

লিখেছেন **গোলাম মোর্তোজা**

১. শুটিংয়ের দিন তারিখ ঠিক করে রেখেছিলেন প্রায় দু'তিন মাস আগে। একটি প্যাকেজ নাটকের শুটিং। নায়ক-নায়িকা, টেকনিশিয়ান সবার সঙ্গে সে অনুযায়ী শিডিউলও ঠিক ছিল। শুটিং হওয়ার কথা ছিল ৫ জুলাই ২০০২। কিন্তু ৩ জুলাই আকস্মিকভাবে তিনি শুটিংয়ের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিলেন।

২. 'এই আছি, এখন আমাদের দিন গণনা চলছে।' বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে এভাবেই জবাব দিলেন একজন সাংবাদিক। এটা ৪ জুলাই রাতের ঘটনা।

উপরের দুটি ঘটনার যোগ সূত্র আছে। আসলে দু'টি ঘটনা নয়। এরকম ঘটনার সংখ্যা অনেক। যাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনাগুলো ঘটছে তার নাম ইটিভি। একুশে টেলিভিশন লিমিটেড। পরিবর্তনে অঙ্গীকার নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করেছিল ২০০০ সালের ১৪ এপ্রিল। সেদিন ছিল বাংলা নববর্ষ। পহেলা বৈশাখ। নতুন বছরের উপহার হিসেবেই মানুষ গ্রহণ করেছিল একুশে টেলিভিশনকে। আশঙ্কা এবং রটনা যে ছিল না তা নয়। কেমন করবে, আদৌ কিছু হবে কিনা, এটা আওয়ামী লীগের টিভি, শেখ রেহানা এর মালিক– এরকম অনেক প্রশ্ন শুরু থেকেই ছিল ইটিভিকে নিয়ে। এসব প্রশ্নের বোঝা মাথায় নিয়েই সামনে এগুতে হয়েছিল ইটিভিকে। ইটিভি আওয়ামী লীগের কিনা, শেখ রেহানা এর অংশীদার কিনা– এই প্রশ্নগুলো এখনো আছে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নগুলোর গুরুত্ব কিছুটা হলেও কমাতে পেরেছিল ইটিভি। তারা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল দর্শকের কাছে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে সেই একুশে টেলিভিশন যখন এগিয়ে যাচ্ছিল পরিণতির দিকে তখনই ঘটে গেল ঘটনাটা। হাইকোর্টের রায়ে বাতিল হয়ে গেল ইটিভির লাইসেন্স। ইটিভি আর অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে পারবে না। আপিল করার সুযোগ পেয়েছিল, করেছিলও। ২ জুলাই সেই আপিল খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বহাল রেখেছে হাইকোর্টের রায়। অবশ্য পুনরায় আপিল করার জন্য সময় দিয়েছে পাঁচ সপ্তাহের। সুপ্রিম কোর্টের একই বেঞ্চ সেই আপিলের সিদ্ধান্ত দেবে।

এই অবস্থায় একুশের কর্মীরা একদিকে হতাশ অন্যদিকে বিক্ষুব্ধ। হতাশ এবং বিক্ষুব্ধ নির্মাতা, শিল্পী, কলাকুশলীরাও। ইটিভি'র পরিণতি কী হতে যাচ্ছে– এদের কাছে সেটা মোটামুটি স্পষ্ট। তাই বাতিল হয়ে যাচ্ছে নাটকের শুটিংয়ের তারিখ, চলছে দিন গণনা। চোখে মুখে কর্মচাঞ্চল্যের ছাপমাখা মানুষগুলোকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল ইটিভি। তাদের সেই স্বপ্ন এখন পরিণত হয়েছে হতাশায়। অনিশ্চয়তা তাদের পুরো অবয়ব জুড়ে।

ইটিভি বাংলাদেশে প্রথম ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, যার ছিল শতভাগ পেশাদারিত্ব মনোভাব। ৭৫ কোটি টাকার বেশ বড় বাজেট নিয়ে কাজে নেমেছিল তারা। এই ৭৫ কোটি টাকার মধ্যে ৪১ কোটি টাকা ছিল ব্যাংক লোন। স্টান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, সিটি ব্যাংক,

ইটিভির মালিকানা

সিটিকর্প ইন্টারন্যাশনাল	৪০%
আইপিডিসি	৪.৪৭%
সী ফিশারিজ এন্ড র‍্যাংগস (রউফ চৌধুরী)	৯.২৩%
এ.এস মাহমুদ এবং পরিবার	১৮.৫৮%
ইসি সিকিউরিটিস (আজম জে. চৌধুরী)	৪.৬২%
আবদুস সালাম	৯.২৩%
নাসির চৌধুরী	৪.৬২%
অ্যাসট্রাস লিমিটেড (স্কয়ার গ্রুপের তপন চৌধুরী)	৪.৬২%
মিডিয়াকম লিমিটেড (স্কয়ার গ্রুপের তপন চৌধুরী)	৪.৬২%
সাইমন ড্রিং	.০১%

আইপিডিসি, সিকিউরিটি একচেঞ্জ ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক এবং ইস্টার্ন ব্যাংক সম্মিলিতভাবে ইটিভিকে দিয়েছিল এই ৪১ কোটি টাকার লোন। ব্যাংকের অর্থ পরিশোধ করা থেকে শুরু করে সব রকমের লেনদেনেই ইটিভির সুনাম রয়েছে।

বিশ্বে যখন স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর দাপট চলছে, তখন আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল বিটিভি। তারপর আস্তে আস্তে কিছু স্যাটেলাইট চ্যানেলের জন্ম হয়েছে দেশে। কিন্তু তারা দেশের সর্বত্র পৌঁছাতে পারেনি টেরিস্টোরিয়াল সুবিধা না থাকার কারণে। ফলে বিটিভির সঙ্গে পেরে ওঠেনি তারা। অত্যন্ত নিম্নমানের অনুষ্ঠান এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনদাতাদের বিটিভির ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়েছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের মতো শিল্পীরাও বন্দী ছিলেন বিটিভির কাছে। যদিও প্যাকেজ অনুষ্ঠান নির্মাণের অনুমতি পাওয়ার পর শিল্পীদের ভাগ্যের পরিবর্তন আসতে থাকে। নির্মাতা, শিল্পী সবাই প্যাকেজ অনুষ্ঠানের দিকে ঝুঁকতে থাকে। সবাই বিটিভির জন্যে প্যাকেজ অনুষ্ঠান নির্মাণ করতে থাকে। ফলে জট লেগে যায়। একটি নাটক জমা দেয়ার দু'তিন বছর পর প্রচার হতে থাকে। এরকম একটি অবস্থায় আত্মপ্রকাশ ঘটে ইটিভির। তারা একই সঙ্গে স্যাটেলাইট এবং টেরিস্টোরিয়াল সুবিধা নিয়ে পৌঁছে যায় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলেও। অনুষ্ঠান নির্মাতা এবং শিল্পীদের কাছে আশীর্বাদ হয়ে আসে ইটিভি। ইটিভিকে কেন্দ্র করে প্যাকেজ অনুষ্ঠান পায় পরিপূর্ণতা।

বর্তমানে ঢাকা শহরে প্রায় ৮০টির মতো টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। একটি টেকনিক্যাল হাউজ প্রতিষ্ঠা করতে বিনিয়োগ করতে হয়েছে কমপক্ষে ২৫ লাখ টাকা। ৮০ লাখ এমন কি ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেও অনেকে গড়ে তুলেছেন টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠান। টেকনিক্যাল হাউজগুলো থেকে ক্যামেরা, লাইটিং, এডিটিং সুবিধা, টেকনিশিয়ান প্রভৃতি ভাড়া নিয়ে অনুষ্ঠান তৈরি করে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো। এই মুহূর্তে ঢাকাসহ দেশে এমন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমপক্ষে ২০০। অর্থাৎ একুশেকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন টেকনিক্যাল হাউজের বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকায়। এক একটি টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রায় ৪০ থেকে ৬০ জন মানুষের জীবন জীবিকা। একমাত্র না হলেও এই টেকনিক্যাল এবং নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম শক্তির উৎস ইটিভি। কারণ মানসম্পন্ন একটি অনুষ্ঠান খুব সহজেই ইটিভির কাছে বিক্রি করা যায়। লাভ বিটিভির তুলনায় কম হলেও দু'তিন বছর অপেক্ষা করে থাকতে হয় না। বিনিয়োগের অর্থটা খুব দ্রুত ফেরত পেয়ে যান নির্মাতা। একটি অনুষ্ঠান বিটিভিতে প্রচার করে হয়তো ২ লাখ টাকা লাভ করা যায়। কিন্তু এর জন্য দুই বছর অপেক্ষা করতে হয়। আর ইটিভিতে একটি অনুষ্ঠান বিক্রি করে লাভ হয়তো ৫০ হাজার টাকা হয়। কিন্তু দুই বছরে ৪টি অনুষ্ঠান ইটিভির কাছে বিক্রি করা যায়। ফলে নাটকসহ সব রকমের প্যাকেজ অনুষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে। সংখ্যা বাড়ার কারণে যদিও মান নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। তবুও এর পুরো সুফলটা ভোগ করতে থাকে শিল্পীরা। বেড়ে যায় শিল্পীদের ব্যস্ততা এবং আয়। পরিবর্তন আসে যাপিত জীবনে। যে শমী কায়সার

> ইটিভি কর্তৃপক্ষ একটি অসম্ভব সুন্দর স্বপ্নের জন্ম দিয়েছিল। সেই স্বপ্নকে হত্যা করার প্রক্রিয়াটিও তারাই তৈরি করে দিয়েছে। ইটিভিকে ঘিরে যে মানুষগুলো স্বপ্ন দেখেছিল, তাদের সেই স্বপ্ন হয়তো পূর্ণতা পেল না। যদিও মানুষগুলো এর জন্য কোনোভাবেই দায়ী নয়

'আদালতের রায়ের প্রতি সরকার পুরোপুরি শ্রদ্ধাশীল থাকবে'

তরিকুল ইসলাম
তথ্যমন্ত্রী

ইটিভির ভাগ্য নিয়ে তথ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলামের সঙ্গে আমাদের কথা হয় ৪ জুলাই দুপুরে সচিবালয়ে তার অফিসে।

সাপ্তাহিক ২০০০ : একুশে টেলিভিশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকার কী ভাবছে?

তরিকুল ইসলাম : সরকার দেখছে বা দেখেছে যে বিগত আওয়ামী সরকারের সময়ে ইটিভিকে যে পদ্ধতিতে ভূমন্ডলভিত্তিক সম্প্রচারের অনুমতি দেয়া হয়েছিল, তার সঙ্গে বর্তমান সরকারের কোনো সংশ্রব না থাকলেও ধারাবাহিকতার কারণে সব অনিয়ম বা অব্যবস্থার দায় পরবর্তী সরকারকে বহন করতে হয়েছে। ইটিভির বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় সরকারকেও অন্যতম অভিযুক্ত বা বিবাদী করা হয়েছে। সরকার আদালতে আইনসম্মত পন্থায় জবাবদিহি করেছে। বর্তমান সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কাজেই সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের প্রতি সরকার পুরোপুরি শ্রদ্ধাশীল।

২০০০ : আমি সরকারের চিন্তা-ভাবনা কী সেটা জানতে চাইছিলাম। এটা বাস্তবতা যে একটি সংবাদ মাধ্যম বা একটি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে বাজারে রয়েছে। প্রচুর দর্শক রয়েছে, জনপ্রিয়তাও রয়েছে?

তরিকুল ইসলাম : আদালত যে রায় দেবে সে রায়ের প্রতি সরকার পুরোপুরি শ্রদ্ধাশীল থাকবে। এখানে সরকারের আলাদা করে চিন্তা-ভাবনার কোনো সুযোগ তো নেই।

২০০০ : সরকার এমন কোনো উদ্যোগ নেবে কিনা যার মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটি টিকে থাকে। সামরিক সরকারের ক্ষমতা দখলকে অবৈধ ঘোষণা করেছিল আদালত। কিন্তু ধারাবাহিকতার স্বার্থে কোনো কিছুই পরিবর্তন করা হয়নি। বাস্তবতাকে মেনে নেয়া

হয়েছে।

তরিকুল ইসলাম : এই রকম কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই সরকারের। সরকারের বর্তমান চিন্তা-ভাবনা আছে যে, আদালত যে রায় বা সর্বোচ্চ আদালত যে রায় দেবে সরকার সেটাকেই মেনে নেবে। পক্ষে দিলেও মেনে নেবে, ইটিভির বিপক্ষে দিলেও মেনে নেবে। এই কারণেই মেনে নেবে যে সরকার সব সময় এবং বর্তমান সরকারও বিশেষ করে এই হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সব সময়ের জন্য। আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলেই ক্ষমতায় এসেছি।

২০০০ : সরকার এই মামলার একটি পক্ষ। সরকারের আসলে ভূমিকাটা কী? সরকার কী সত্যিই আন্তরিকভাবে চায় যে, এই মামলায় সরকার জিতুক?

তরিকুল ইসলাম : সরকার তো অভিযুক্ত। সরকারকে তো অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং সরকারকে বিবাদীও করা হয়েছে। ব্যক্তি আদালতে মামলা করেছে সেখানে সরকারকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। সরকারের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল দায়িত্ব পালন করছেন।

২০০০ : সরকার কি এই মামলায় জেতার জন্য চেষ্টা করেছে?

তরিকুল ইসলাম : সেটা তো অ্যাটর্নি জেনারেল সব সময় তার পক্ষে বলেছে। অ্যাটর্নি জেনারেল যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা দেখলেও বোঝা যাবে সরকার চেষ্টা করেছে।

২০০০ : অ্যাটর্নি জেনারেলের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কী বিশেষ কোনো নির্দেশ দেয়া হয়েছিল?

তরিকুল ইসলাম : না, নির্দেশ ছিল না। নির্দেশ থাকার কথাও না। যেটা অ্যাটর্নি জেনারেল বাস্তবসম্মত এবং যেটা সঠিক প্রক্রিয়া মনে করেছেন সেভাবেই এটাকে নিয়ে লড়েছেন।

২০০০ : আপনার ব্যক্তিগত মত কি? আপনার কি মনে হয় যে, একটি প্রতিষ্ঠান, যেটি আপনি বলছিলেন ভূমন্ডলভিত্তিক একমাত্র টেলিভিশন চ্যানেল বাংলাদেশে শুধু না, এটি সম্ভবত দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র বেসরকারি মালিকানাধীন ভূমন্ডলভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল। আপনি কি চান, এটি টিকে থাকুক?

তরিকুল ইসলাম : বিষয়টি আদালতে রয়েছে। এখানে আমার ব্যক্তিগত মতামত গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে চাইলে তো হবে না। যেকোনো ব্যক্তি এই ইচ্ছা করলেই ইচ্ছা প্রতিফলিত হবে না। এটা কোর্টে বা আদালতে গড়িয়েছে এবং হাইকোর্টে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং সুপ্রিম কোর্টে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন এটা রিভিউতে আছে। রিভিউতে যে সিদ্ধান্ত হবে সেটাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

২০০০ : আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি একুশে টেলিভিশন বন্ধ হয়ে যায়, সরকার কি নতুন লাইসেন্স দেয়ার মাধ্যমে ইটিভিকে বাঁচিয়ে রাখবে?

তরিকুল ইসলাম : সেটা এখন বলতে পারব না। এখনো সেই সময় হয়নি।

বিটিভিতে একটি নাটক করে পেতেন ২ হাজার ৫ শ' টাকা, সেই শমী কায়সার একটি প্যাকেজ নাটক করে পেতে থাকেন ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা। যা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়েছে ২৫ হাজারে।

তারিন, ইশিতারা বিটিভির একটি নাটক করে পেতেন ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকা। প্যাকেজ নাটকে এসে তারা পেতে শুরু করেন ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা। যা এখন ১০ থেকে ১২ হাজারে উঠেছে। শিল্পীদের এই ভাগ্য পরিবর্তনে ইটিভি রেখেছে বিশাল বড় ভূমিকা। ফলে গত দু'তিন বছরে অনেক ভালো নির্মাতা এবং অভিনয় শিল্পীর জন্ম হয়েছে।

টেকনিক্যাল এবং অনুষ্ঠান নির্মাণ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বেশ বড় একটি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। শিল্পীদের কাছে অভিনয় এখন আর নেশা বা শখ নয়, পেশা।

এখন ইটিভি যদি না থাকে তাহলে টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা কী হবে? নির্মাতারা কী আর অনুষ্ঠান তৈরি করবে না? অভিনয় শিল্পীদের জীবনে কী বিপর্যয় নেমে আসবে? বর্তমান সময়ে এই প্রশ্নগুলো খুব স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ইটিভি না থাকলেও নির্মাতারা অনুষ্ঠান তৈরি করবে। টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলোও সব হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাবে না। শিল্পীরাও অভিনয় করবে। কারণ বিটিভি অনুষ্ঠান কিনবে। চালু থাকবে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোও। তবে ইটিভি না থাকার শূন্যতাটা পূরণ হবে না। যদি না ইটিভির মতো কোনো প্রতিষ্ঠানের এর মধ্যে জন্ম হয়। আশঙ্কা এখানেই যে অল্প সময়ের মধ্যে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান জন্মের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ফলে টেকনিক্যাল, নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সবার ওপরই ইটিভি না থাকার একটা প্রভাব পড়বে। অনিশ্চয়তা কিছুটা হলেও সবার জীবনেই আসবে। বিশেষ করে বড় টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলো ভালো সমস্যায় পড়বে। কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলোর রয়েছে ব্যাংক ঋণ। কাজ কমে যাওয়ায় আয়ও কমে যাবে। ফলে নিয়মিত ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করাটা হয়তো অনেকের জন্য সমস্যা হয়ে যাবে। ফলে কিছু প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। প্যাকেজ নাটক থাকবে, কমে যাবে শিল্পীদের পারিশ্রমিক ও ব্যস্ততা। নতুনরা অনেকেই অভিনয়কে পেশা হিসেবে নিতে সাহস করবে না।

এরা সবাই ইটিভির সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত। এবার আসা যাক প্রত্যক্ষভাবে জড়িতদের বিষয়ে। ইটিভির মোট কর্মী সংখ্যা ২৬৩ জন। অনেক নাম না জানা তরুণ ইটিভিতে কাজ করে তারকা মর্যাদা পেয়েছেন। পেয়েছেন আর্থিকভাবে সচ্ছল জীবন যাপনের নিশ্চয়তা। বেশ কিছু মেধাবী যুবককে ইটিভি দেশে ফিরিয়ে এনেছিল। এই মেধাবীরা কখনো দেশে ফিরে আসে না মূলত দু'টি কারণে। এক. দেশে কাজের সুযোগ নেই। দুই. তাদের আর্থিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। ইটিভি এই দু'টি শর্তই পূরণ করে বেশ কিছু মেধাবীকে দেশে ফিরিয়ে এনেছিল।

ইটিভির কার্যক্রম যদি না থাকে তাহলে এই ২৬৩ জন কর্মীর অবস্থা কী হবে? কর্মরত সাংবাদিকরা কোথায় চাকরি করবে? তাদের নেয়ার মতো ক্ষমতা দেশের অন্য কোনো ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার নেই। অল্প কয়েকজন

ইটিভির লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়াটিকে আদালত বলেছে 'ধোঁয়াটে', 'গোঁজামিল' এবং 'অসচ্ছ'। ...ইটিভি পরিবর্তনে অঙ্গীকারের কথা বলে, বলে মুক্ত সাংবাদিকতার কথা। চ্যানেল আইয়ের বিরুদ্ধে এই কেস করা থেকে বেরিয়ে আসে তাদের হীনম্মন্যতার কথা

হয়তো আবার প্রিন্ট মিডিয়ায় ফিরে আসতে পারবেন। আর্থিকভাবে এখন তিনি যে জীবনযাপন করেন সেই অবস্থা ধরে রাখতে পারবেন বলে মনে হয় না। এছাড়া বড় অংশটির প্রিন্ট মিডিয়ায় চাকরি পাওয়াও হয়তো সহজ হবে না। ফলে এক ঝাঁক তরুণের জীবনের শুরুতেই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তার মুখে পড়ার। ইটিভির তরুণ অনুষ্ঠান নির্মাতাসহ প্রায় সবার ক্ষেত্রেই বলা যায় একই কথা।

এক সময় বিটিভির অনুষ্ঠান দেশের মানুষ খুব মন দিয়ে দেখতো। সে সময় অনেক ভালো নির্মাতা ছিলেন বিটিভিতে। এই নির্মাতাদের অনেকে বিটিভি ছেড়ে দিয়েছেন। অনেকে আবার চাকরি শেষ করে অবসরে চলে গেছেন। কিন্তু শূন্যস্থানে মেধাবী তরুণদের জায়গা হয়নি বিটিভিতে। লাইটবয়, টেকনিশিয়ানরা প্রমোশন এবং তদবিরে পরিণত হয়েছেন প্রযোজকে। অনুষ্ঠানের মানও যা হওয়ার তাই হয়েছে। সম্ভবত এর চেয়ে খারাপ আর হওয়া সম্ভব নয়। ফলে দর্শক হারাতে থাকে বিটিভি। দর্শক মূলত স্যাটেলাইট নির্ভর হয়ে পড়ে। স্যাটেলাইটের এই জয়জয়কার সময়ে জন্ম নেয় ইটিভি। একঝাঁক প্রতিভাবান তরুণ নির্মাণ করতে থাকে কিছু অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের মান, পরিকল্পনা, উপস্থাপনা সব কিছুতেই একটা ইতিবাচক পরিবর্তন আনে ইটিভি।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে ইটিভির সংবাদের কথা। দেশের মানুষ সংবাদপত্রের পাশাপাশি প্রতিদিন সন্ধ্যায় কান পেতে বিবিসি শুনতে অভ্যস্ত। বিশেষ করে দেশের কোনো সংকটকালে সেটা বেশি লক্ষ্য করা যেত। কারণ দেশের সংবাদ মাধ্যম বিটিভি বা রেডিও'র সংবাদ শুনে বাস্তবতা বোঝা যায় না। সংবাদপত্র থেকে আসল ঘটনা জানা যায়। কিন্তু সেটা তো পরের দিন সকালে। সেদিনের ঘটনা সেদিনই জানতে চায় মানুষ। তাই দেশের ঘটনা জানার জন্য তাকে শুনতে হতো বিদেশের খবর। ইটিভির খবর মানুষের কাছে বিবিসির গুরুত্ব অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছে। ইটিভির পাশাপাশি চ্যানেল আই এখন মান সম্পন্নভাবে খবর প্রচার করছে। তারা দিন দিন উন্নতি করছে। এখানেও কৃতিত্বটা পায় ইটিভি। কারণ এই ধারাটা তাদের তৈরি। বিবিসির প্রশিক্ষকদের এনে তারা সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যোগ্য করে গড়ে তুলেছে। 'দেশজুড়ে' ইটিভির একটি অসাধারণ সুন্দর অনুষ্ঠান। 'মুক্ত খবর'ও সংবাদের মতোই জনপ্রিয়। এছাড়া ভালো অনুষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করা যায় ইটিভির আরো বেশ কিছু অনুষ্ঠান রয়েছে। টিন

এ এস মাহমুদ
চেয়ারম্যান, একুশে টেলিভিশন

এজারদের জন্য যে অনুষ্ঠান তৈরি করা যায় তার প্রমাণ দিয়েছিল একুশে। একই সময়ে উল্লেখ করার মতো কোনো অনুষ্ঠান বিটিভির নেই। বিটিভি ভবিষ্যতে যে ভালো অনুষ্ঠান নির্মাণ করে মানুষের চাহিদা মেটাবে তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। কারণ সরকারের তোষামোদ করা ছাড়া আর কোনো কিছুতেই তাদের কোনো পরিকল্পনা নেই। সুতরাং ইটিভির অবর্তমানে দর্শককে আবার ভিনদেশী স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়তে হবে। দেশী স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর মধ্যে চ্যানেল আই কিছু ভালো কাজ করছে। তবে তাদের ক্ষমতা সম্ভবত সীমিত। ইটিভির মতো বড়ভাবে কাজে আসার পরিকল্পনা তাদের আছে বলে মনে হয় না। এছাড়া দেশের আর একটি স্যাটেলাইট চ্যানেল এটিএন বাংলা উল্লেখ করার মতো তেমন কিছু করছে না।

হিন্দি সংস্কৃতি আগ্রাসনের কথা যারা বলেন তাদের জন্যে দুঃসংবাদ হলো আগামী সময়টাতে সেটা আরো বাড়ার সুযোগ পাবে।

আজ যদি যমুনা ব্রিজ প্রকল্পে বিশাল কোনো দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে যমুনা ব্রিজের ভাগ্যে কী ঘটবে? যমুনা ব্রিজ কী ভেঙে ফেলা হবে? এরশাদ সরকার দুর্নীতি করে মেঘনা ব্রিজ প্রস্থে ছোট করে তৈরি করেছিল। কিন্তু মেঘনা ব্রিজ এখনো অক্ষত আছে।

'ইটিভি যদি না থাকে'– এই কথাটি কয়েকবার লিখেছি। ইটিভির মতো একটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটা লিখতে হচ্ছে কেন? ইটিভি তো আর আদমজী জুট মিল নয়, যে বছরে ১৮০ কোটি টাকা লোকসান দেয়। সে কারণে বন্ধ করে দেয়া হবে। এ বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এই চার মাসে ইটিভি মোট আয় করেছে ২৯ কোটি ১৭ লাখ টাকা। যার মধ্যে নিট লাভ ৬ কোটি ৫২ লাখ টাকা। যা বিটিভির এই সময়ে আয়ের চেয়ে প্রায় ৬০% বেশি। এটা হলো প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক অবস্থার চিত্র। রয়েছে যোগ্য লোক, অনুষ্ঠানের মান ভালো, রয়েছে দর্শকপ্রিয়তা। এই রিপোর্টেই লিখেছি সম্পূর্ণ পেশাদারিত্ব মনোভাব নিয়ে জন্ম নিয়েছিলো ইটিভি। একটি প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন হয়, আপাতদৃষ্টিতে তার সবই রয়েছে ইটিভির। তারপরও সম্ভাবনা রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার। কারণ ইটিভির জন্ম নেয়ার প্রক্রিয়াতেই রয়েছে সমস্যা, অস্বচ্ছতা।

বেসরকারি মালিকানায় টেলিভিশন প্রতিষ্ঠার জন্য বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছিলো। টেন্ডারে অংশ নেয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান। অন্য তিন সদস্য ছিলেন বাংলাদেশ বেতারের প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ আবদুস সাকের, বেতারের গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্রের স্টেশন প্রকৌশলী মনোরঞ্জন দাশ এবং বিটিভির ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার মোহাম্মদ মোস্তাকুর রহমান।

এই কমিটি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঁচটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়।

১. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সুষম অনুষ্ঠান।
২. দেশব্যাপী এবং বহির্বিশ্বে অনুষ্ঠান প্রচারের ধারণা ও লক্ষ্যমাত্রা।

৩. টিভি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য কারিগরি প্রস্তাবনা।
৪. বিনিয়োগ প্রস্তাব।
৫. নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সিরিয়াসনেস।

টেণ্ডারে অংশ নিয়েছিলো ১৭টি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে শুরুতেই শর্ত পূরণ না করায় অযোগ্য বিবেচিত হয় 'মাইনার্ড (বাংলাদেশ) লিমিটেড' নামক একটি প্রতিষ্ঠান। অন্য ১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অগ্রাধিকার এবং সন্তোষজনক এই দুই ক্যাটাগরিতে ৬টি প্রতিষ্ঠানের তালিকা করা হয়। অন্য ১০টি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব অযোগ্য বিবেচিত হয়। এই ১০টি অযোগ্য প্রতিষ্ঠানের তালিকায় ইটিভির অবস্থান ছিলো ৫ নম্বরে।

কিন্তু পরবর্তীতে প্রথম মূল্যায়ন রিপোর্টটি বাতিল করে আরেকটি মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি করা হয়। দ্বিতীয় এই রিপোর্টে একুশে টেলিভিশন চলে আসে এক নম্বরে। দুই নম্বরে আসে প্রথমেই বাদ হয়ে যাওয়া 'মাইনার্ড (বাংলাদেশ) লিমিটেড।' এই রিপোর্টে মোট ৮টি প্রতিষ্ঠানকে রাখা হয়েছিলো।

প্রথম রিপোর্টটি কেন বাতিল হলো? দ্বিতীয় রিপোর্টে ইটিভি কিভাবে এক নম্বরে চলে এলো? কোনো ফাইলে প্রশ্নগুলোর উত্তর নেই। হাইকোর্টের রায়ে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে, 'দ্বিতীয় রিপোর্টে উল্লেখ আছে নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে এই আটটি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু এ শর্তগুলো যে কি সে বিষয়ে রিপোর্টে কিছু উল্লেখ নেই। এমনকি কে এই শর্তগুলো নির্ধারণ করবে তারও উল্লেখ নেই।'

ইটিভির লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়ায় বারবার অস্বচ্ছতার কথা বলা হয়েছে আদালতের রায়ে। অস্বচ্ছতা যেখানে থাকে সেখানেই থাকে দুর্নীতির গন্ধ। শুরু থেকেই ইটিভির গায়ে লেগে আছে এই গন্ধ। দ্বিতীয় রিপোর্ট যে ফাইলে থাকার কথা আদালত সেই ফাইলটি দু'বার দেখতে চায়। কিন্তু ফাইলটি আদালতে হাজির করা হয়নি। হাইকোর্ট রায়ে বলেছে, 'আমরা দু'বার ফাইল আদালতে হাজির করতে বলেছি। কিন্তু ফাইল আদালতকে দেখতে দেয়া হয়নি। এমনকি ফাইলের অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলাও হয়নি। আমরা বুঝতে পারি না যে ফাইল ছাড়া কিভাবে টেন্ডার হলো, যেখানে শত কোটি টাকা যুক্ত।'

কিছু শর্ত পূরণ সাপেক্ষে দ্বিতীয় রিপোর্টে বিবেচনা করা হয় ৮টি প্রতিষ্ঠানকে। মামলায় ইটিভি এই রিপোর্টটিকে গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করতে চেয়েছে। রায়ের এই অংশে আদালত বলেছে, 'যে রিপোর্টের ওপর বিবাদী পক্ষ এতো গুরুত্ব দিলো, দেখা গেলো সেই রিপোর্টটিও আসলে অসম্পূর্ণ। রিপোর্টে কিছু শর্তসাপেক্ষে ৮টি প্রতিষ্ঠানকে বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে মন্ত্রণালয় ইটিভিকে কিভাবে সবচেয়ে যোগ্য বলে বিবেচনা করলো? যেকোনো টেন্ডারের

হাইকোর্টের রায়ে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে, 'দ্বিতীয় রিপোর্টে উল্লেখ আছে নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে এই আটটি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু এ শর্তগুলো যে কি সে বিষয়ে রিপোর্টে কিছু উল্লেখ নেই। এমনকি কে এই শর্তগুলো নির্ধারণ করবে তারও উল্লেখ নেই'

একনজরে ইটিভি

১৯৯৮ : এই বছরের প্রথমার্ধে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনার লাইসেন্স গ্রহণে আগ্রহী কোম্পানিদের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়। পাঁচ লাখ টাকার বিড-বন্ডসহ এতে সাড়া দেয় ১৭টি কোম্পানি। এই টেন্ডারে অংশগ্রহণ করে একুশে টেলিভিশন। ২ জুলাই দরপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় পাঠায় কারিগরি মানদন্ড নিরূপণ কমিটির কাছে।

৯ জুলাই কারিগরি মানদন্ড নিরূপণ কমিটি প্রস্তাবগুলো মূল্যায়ন করে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আকমল হোসেনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সেই রিপোর্টে উল্লেখ করেন প্রিন্ট মিডিয়া, এনজিও এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সাধারণত টেলিভিশন নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠায় নিরুৎসাহিত করা হয়। প্রতিবেশী ভারতে এই নীতি অনুসরণ করা হয় বলে তারা উল্লেখ করেন।

১৯৯৯ : এই বছর ৯ মার্চ তারিখে সম্পাদিত লাইসেন্সিং চুক্তিনামায় উপস্থিত ছিলেন দু'পক্ষ। একপক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যপক্ষ একুশে টিভির পক্ষে আবু সায়ীদ মাহমুদ।

১৮ মার্চ তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আকমল হোসেনকে একুশে টেলিভিশন লিমিটেডের নামে লাইসেন্স হস্তান্তরের অনুমতি চেয়ে আবু সায়ীদ মাহমুদ স্বাক্ষরিত এক পত্র প্রেরণ করা হয়।

৫ এপ্রিল তথ্য মন্ত্রণালয় তার স্বাক্ষরিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে একুশে টেলিভিশন লিমিটেডের নামে লাইসেন্স হস্তান্তরের অনুমতি দেয়।

২০০০ : এই বছর ১৪ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করে।

২০০১ : এই বছর সেপ্টেম্বরে একুশে টিভির লাইসেন্স বৈধভাবে দেয়া হয়নি এবং যথাযোগ্য মূল্য ছাড়াই অনিয়মের মাধ্যমে তারা বিটিভির সম্পদ ব্যবহার করায় রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে। এমনকি বিটিভির দ্বিতীয় চ্যানেলকেও বিনা ভাড়ায় এই প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দেয়ায় রাষ্ট্রের বার্ষিক ৬০ লাখ টাকা ক্ষতি হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়। জনস্বার্থের মামলা আকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহমুদ হাসান, অধ্যাপক এমএ রব এবং সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী এই মামলা দায়ের করেন।

২৬ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ রুলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত টেরিস্টোরিয়াল চ্যানেল বন্ধ রাখার জন্য একুশে টেলিভিশনের প্রতি নির্দেশ দেয়। রায় দান শেষে সরকার ও সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার সুযোগদানের জন্য অত্র রায়ের কার্যকারিতা স্থগিতের জন্য প্রার্থনা করেন। আদালত শুনানি শেষে অত্র রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করেন।

২০০২ : ২৭ মার্চ হাইকোর্ট সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় চরম জালিয়াতির কারণে ইটিভির লাইসেন্স অবৈধ ও অকার্যকর ঘোষণা করে রায় দেন।

২ জুলাই একুশে টিভির লাইসেন্স অবৈধ ঘোষণা সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ইটিভি কর্তৃপক্ষের আপিল দায়ের অনুমতির আবেদন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ খারিজ করে দেয়। উভয় পক্ষের শুনানির পর রিভিউ পিটিশন দাখিলের শর্তে ৫ সপ্তাহের জন্য রায় স্থগিত ঘোষণা করা হয়। আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আনীত অন্য ৪টি লিভ টু আপিল আবেদনও খারিজ করে দেয়।

রুহুল তাপস

মৌলিক বিষয় হচ্ছে যদি শর্ত বা নিয়মের কোনো পরিবর্তন করা হয়, তবে প্রতিটি অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই সেসব নতুন নিয়মাবলী জানাতে হবে।'

তথ্য মন্ত্রণালয় ইটিভি ছাড়া তালিকার অন্য আটটি প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে কিছুই জানায়নি। ফলে তারা সেই কথিত শর্ত পূরণ করারও সুযোগ পায়নি। তথ্য মন্ত্রণালয় ইটিভিকে যন্ত্রপাতি বসানোর এবং অনুষ্ঠান সম্প্রচারের অনুমতি দেয়ার জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একটি ফাইল পাঠায়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো এই প্রস্তাবে প্রথম রিপোর্টের কোনো উল্লেখ ছিলো না। যা অবশ্যই থাকা উচিত ছিলো। আদালত বলেছে, 'সত্যকে পুরোপুরি ধামাচাপা দেয়া হয়েছে। এখানেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রয়োজন। ... আমরা টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ নই। তাই প্রস্তাব টেকনিক্যালি যোগ্য ছিলো কিনা সেটা আমাদের পক্ষে বলা সঠিক নয়। আমরা জানতে চেয়েছি আগের রিপোর্টের সিদ্ধান্ত কেন এবং কিভাবে পরিবর্তন করা হলো। কিন্তু এটা খুবই দুঃখজনক যে, কোনো বিবাদী পক্ষই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি।'

যদি কোনো রিপোর্ট বদলানো হয় তবে তার নিশ্চয় কোনো কারণ থাকবে এবং কারণগুলো অবশ্যই রেকর্ডে থাকবে। এই বিষয়টি নিয়ে কোনো মামলা হলে, কোর্ট যদি সেই ফাইল বা রেকর্ড দেখতে চায় তাহলে অবশ্য সেটা দেখাতে হবে। আদালত বলেছে, 'আমরা দু'টি কারণ দেখিয়ে বলতে চাই যে সত্যকে আড়াল করা হয়েছে। প্রথমত, শর্তাবলী বদলের কথা দ্বিতীয় রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি এবং ফাইলটিও উপস্থাপন করা হয়নি। দ্বিতীয় কারণ, সেই রিপোর্টে বলা আছে যে, শুধুমাত্র কিছু শর্ত পূরণ সাপেক্ষে যে প্রক্রিয়া মেনে এসেছে সেটি ধোঁয়াটে (hazy) এবং গোঁজামিল (bluer) এবং স্বচ্ছ (transparent) নয়। সিদ্ধান্তে আসার প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ ছিলো না। আমাদের মতে পুরো ব্যাপারটিতে কোথাও একটা ভুল ছিলো। যেটি বিবাদী খুব সচেতনভাবে আদালতের জানার বাইরে রাখতে চেয়েছে। এই যুক্তির ভিত্তিতে আমাদের দৃষ্টিতে পুরো ব্যাপারটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে আড়াল করে রাখা হয়েছে।'

এএস মাহমুদের লাইসেন্স পাওয়া এবং সেটা একুশে টেলিভিশন লিমিটেডের নামে টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে আদালত রায়ে বলেছে, 'রুলস অব বিজনেস, সংবিধানের ১৪৬ অনুচ্ছেদ, টেলিগ্রাফি অ্যাক্ট ১৮৮৫-এর ওয়ারলেস অ্যান্ড টেলিগ্রাফি অ্যাক্ট ১৯৯৩– সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় যে, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং এএস মাহমুদের মধ্যে লাইসেন্স স্বাক্ষর সংক্রান্ত চুক্তিকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ফেলা না গেলেও বেআইনি বলা যাবে না। ...এএস মাহমুদ মেসার্স ইটিভির পক্ষে টেন্ডারের কাজ জমা দিয়েছিলেন। কারণ সেই সময় ইটিভি নথিভুক্ত প্রতিষ্ঠান (রেজিস্টার্ড) ছিলো না। যেহেতু এএস মাহমুদ প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী হিসেবে প্রস্তাব জমা দিয়েছেন, তাই জনাব মাহমুদের সঙ্গে করা চুক্তিকে বেআইনি বলা যাবে না। কিন্তু আমরা আমাদের আগের আলোচনায় দেখেছি যে, যেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ইটিভি'র প্রস্তাব গ্রহণ হয়েছে সেটি অস্বচ্ছ। তাই আমাদের দৃষ্টিতে তাদের লাইসেন্স দেয়ার ব্যাপারটি বেআইনি। সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়া যেহেতু প্রশ্নসাপেক্ষ এবং যেহেতু বিবাদীরা আদালতকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কোন যুক্তিতে এবং কিভাবে দু'টি রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে, কমিটি কোন কারণে প্রথম রিপোর্টে উল্লিখিত যোগ্যদের নাম বদল করে দ্বিতীয় রিপোর্ট জমা দেয়। আদালত জানতে চায় ইটিভি যেখানে প্রথম রিপোর্টে একদমই অযোগ্য হিসেবে ঘোষিত হয়, তারা কিভাবে দ্বিতীয় রিপোর্টে প্রথম হয় এবং মন্ত্রণালয় কিভাবে একটি অসম্পূর্ণ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ইটিভিকে যোগ্য মনে করেছে এটি এখনও আমাদের কাছে একটি গভীর রহস্য। কমিটি এবং মন্ত্রণালয়ের এসব কার্যকলাপ পুরোপুরি অস্বচ্ছ। সবশেষে, এটিই হলো সর্বাত্মক সিদ্ধান্ত। এটি ঘোষণা করা হচ্ছে যেভাবে ইটিভিকে সবচেয়ে যোগ্য হিসেবে যে বিবাদী পক্ষ নং-১ (সরকার) তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং লাইসেন্স দিয়েছে সেটির কোনো আইনগত এখতিয়ার নেই এবং আইনের কোনো ফলাফল নেই।'

ইটিভির লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়াটিকে আদালত বলেছে 'ধোঁয়াটে', 'গোঁজামিল' এবং 'অসচ্ছ'। ইটিভির মতো একটি প্রতিষ্ঠানের এমন আচরণ করার কারণ কী? তারা কী বুঝতে পারেনি এই গোঁজামিলের জন্যে পরবর্তীতে কোনোদিন বিপদে পড়তে পারে? আসলে তারা বুঝতে চায়নি। এটাকেই সম্ভবত দাম্ভিকতা বলে। কোনো কিছুকেই পাত্তা না দেয়া। ইটিভি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরাসরি যোগাযোগ ছিল। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজমুখেও একাধিকবার সেকথা বলেছেন। হাসিনা দাবি করেছেন একুশে নামটি তারই দেয়া। ক্ষমতার এত কাছাকাছি থেকেও ইটিভি কর্তৃপক্ষ আইনগত বৈধতার জন্য অতীব জরুরি কাগজপত্রগুলো তৈরি করেনি, সংরক্ষণ করেনি। ক্ষমতা মানুষকে অহংকারী করে তোলে। সবসময় বা সবার ক্ষেত্রে একথা সত্য না হলেও ইটিভির ক্ষেত্রে হয়তো এটা সত্য হয়েছে। ইটিভির তুলনায় 'চ্যানেল আই' অনেক ছোট প্রতিষ্ঠান। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারই এই প্রতিষ্ঠানটিকে সংবাদ প্রচারের অনুমতি দিয়ে যায়। সংবাদ প্রচারের জন্য অপরিহার্য যন্ত্রটির নাম 'এসএনজি মেশিন'। টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে 'চ্যানেল আই' একটি এসএনজি মেশিন আমদানি করে। মেশিনটি যেদিন এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছায় সেদিনই চ্যানেল আই-এর বিরুদ্ধে কেস করে ইটিভি। এবং এই অযৌক্তিক মামলায় ইটিভি হেরে যায়। চ্যানেল আই সংবাদ প্রচার শুরু করে।

ইটিভি পরিবর্তনে অঙ্গীকারের কথা বলে, বলে মুক্ত সাংবাদিকতার কথা। চ্যানেল আইয়ের বিরুদ্ধে এই কেস করা থেকে বেরিয়ে আসে তাদের হীনম্মন্যতার কথা। ইটিভির বিরুদ্ধে গিয়াস কামাল চৌধুরীসহ তিনজনের দায়ের করা মামলার সূত্রপাত এই সময় থেকে বলে ধারণা করা হয়।

ইটিভি নামক এই প্রতিষ্ঠানটি একই সঙ্গে শতভাগ পেশাদারিত্ব। আবার একই সঙ্গে চরম দায়িত্ব জ্ঞানহীন। ইটিভি কর্তৃপক্ষ একটি অসম্ভব সুন্দর স্বপ্নের জন্ম দিয়েছিল। সেই স্বপ্নকে হত্যা করার প্রক্রিয়াটিও তারাই তৈরি করে দিয়েছে। ইটিভিকে ঘিরে যে মানুষগুলো স্বপ্ন দেখেছিল, তাদের সেই স্বপ্ন

আদালতের রায়ে স্পষ্ট হয়ে গেছে একুশের লাইসেন্স প্রাপ্তি নিয়ে অস্বচ্ছতার বিষয়টি। কিন্তু এর জন্য দায়ী কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষ। অথচ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভুক্তভোগী হচ্ছেন এদেশের বিরাট দর্শকশ্রেণী ও কয়েকশ' প্রফেশনাল যারা সুন্দর জীবনের স্বপ্ন বুনছিলেন।

হয়তো পূর্ণতা পেল না। যদিও মানুষগুলো এর জন্য কোনোভাবেই দায়ী নয়। ইটিভির এই পরিণতির জন্যে দায়ী ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অল্প কয়েকজন। অস্বচ্ছতা, দুর্নীতি, ধোঁয়াটে, গোঁজামিল যে প্রক্রিয়াতেই ইটিভির জন্ম হোক না কেন– এর কর্মীরা কোনোভাবেই এর জন্যে দায়ী না। অথচ ফলাফলটা ভোগ করতে হচ্ছে তাদেরই।

আজ যদি যমুনা ব্রিজ প্রকল্পে বিশাল কোনো দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে যমুনা ব্রিজের ভাগ্যে কী ঘটবে? যমুনা ব্রিজ কী ভেঙে ফেলা হবে? এরশাদ সরকার দুর্নীতি করে মেঘনা ব্রিজ প্রস্থে ছোট করে তৈরি করেছিল। জাপানি প্রধানমন্ত্রী ব্রিজ দেখে দেশে ফিরে গিয়ে একথা বলেছিলেন। কিন্তু মেঘনা ব্রিজ এখনো অক্ষত আছে।

ব্যাংকগুলো ইটিভি'র লাইসেন্সসহ অন্যান্য কাগজপত্র দেখে লোন দিয়েছিল। ব্যাংকগুলোর পক্ষে কোনোভাবেই জানা সম্ভব ছিল না লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়াটি সঠিক ছিল কিনা। আদালতও রায়ে বলেছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো প্রস্তাবের ফাইলে প্রথম রিপোর্টের কথা কিছু লেখা হয়নি। পুরোপুরি গোপন করা হয়েছে। গোপন করেছে কারা? তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী আবু সাইয়িদ অথবা তথ্য সচিব অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কেউ। তাহলে এখানে অপরাধটা করলো কে? যে বা যারা ফাইলটি প্রস্তুত করলো, প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠালো তারা। কিন্তু আদালতের রায়ে তাদের বিষয়ে কোনো করা হয়নি। আদালতের রায়ে স্পষ্ট হয়ে গেছে একুশের লাইসেন্স প্রাপ্তি নিয়ে

> আদালত বলেছে, 'সত্যকে পুরোপুরি ধামাচাপা দেয়া হয়েছে। এখানেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রয়োজন। ... আমরা টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ নই। তাই প্রস্তাব টেকনিক্যালি যোগ্য ছিলো কিনা সেটা আমাদের পক্ষে বলা সঠিক নয়। আমরা জানতে চেয়েছি আগের রিপোর্টের সিদ্ধান্ত কেন এবং কিভাবে পরিবর্তন করা হলো। কিন্তু এটা খুবই দুঃখজনক যে, কোনো বিবাদী পক্ষই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি'

সামরিক শাসনকে আদালত অবৈধ বলেছে। কিন্তু সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে সেই রায় বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

অস্বচ্ছতার বিষয়টি। কিন্তু এর জন্য দায়ী কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষ। অথচ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভুক্তভোগী হচ্ছেন এদেশের বিরাট দর্শকশ্রেণী ও কয়েকশ' প্রফেশনাল যারা সুন্দর জীবনের স্বপ্ন বুনছিলেন।

একুশে টেলিভিশন স্বপ্ন দেখিয়েছিল এদেশের দর্শকদের। হিন্দি সিরিয়াল 'কিউ কি সাস ভি কাভি বহু থি' এর পাশাপাশি আমরা দেখতে শুরু করেছিলাম বন্ধন। একুশেই আমাদেরকে ধরে রাখতে পেরেছে বাংলা চ্যানেল দেখার জন্য। নির্মাতা, শিল্পীদের একুশে স্বপ্ন দেখিয়েছিল ক্রিয়েটিভ মিডিয়াতে কাজ করেও সচ্ছল জীবন যাপন সম্ভব। বিনিয়োগকারীরা বুঝেছিল গুড ম্যানেজমেন্ট মানে গুড বিজনেস। স্বপ্ন তারাও দেখেছিল। এই স্বপ্ন পেয়েছিল বিস্তৃতি। অনেকেই স্বপ্ন দেখছিলেন টেরিস্টোরিয়াল চ্যানেলের।

একুশে টেলিভিশনের মৃত্যু ভেঙে দিচ্ছে এই সব স্বপ্নকে।

আদালতের রায়ে ইটিভি যদি বন্ধ হয়ে যায়, তারপর কী ঘটবে? ইটিভি কী নতুন করে লাইসেন্স চেয়ে সরকারের কাছে আবেদন করবে? আবেদন করলে লাইসেন্স পাওয়ার সম্ভাবনা কতটা? এই পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে সরকারের আন্তরিকতার ওপর। একটি সূত্র জানায় সরকার নিজের অবস্থান পরিষ্কার রাখার জন্য শুধুমাত্র স্যাটেলাইট লাইসেন্স দিলেও দিতে পারে। টেরিস্টোরিয়াল সম্প্রচারের সুবিধা মনে হয় না ইটিভি পাবে। যদি শুধুমাত্র স্যাটেলাইট লাইসেন্স পায় তাহলে কী ইটিভির পক্ষে এখন যেভাবে কাজ করছে সেটা করা সম্ভব হবে?

প্রশ্নের উত্তর সময়ই বলে দেবে।

সহযোগিতা : **রুহুর তাপস**
মিশায়েল আহমাদ